بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ০৭ তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ আনসারী (রা.)। হযরত মুহাম্মদ (রা.)'র পিতার নাম ছিল মাসলামাহ্ বিন সালামাহ্। তার দাদার নাম সালামাহ্ ছাড়া খালেদও উল্লেখ করা হয়েছে। তার মা ছিলেন উম্মে সাহ্‌ম, যার (আসল) নাম ছিল খুলায়দাহ্ বিনতে আবু উবায়দাহ্। তিনি আনসারদের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং আব্দে আশহাল গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ বা আব্দুর রহমান এবং আবু সাঈদও বর্ণনা করা হয়। আল্লামা ইবনে হাজ্‌র-এর মতে বেশি সঠিক হল, আবু আব্দুল্লাহ্। এক ভাষ্য মতে তিনি মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের বাইশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেসব লোকের একজন ছিলেন যাদের নাম অজ্ঞতার যুগে **'মুহাম্মদ'** রাখা হয়েছে। **{আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইসাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৬, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

মদীনার ইহুদীরা সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিল যার সুসংবাদ হযরত মূসা (আ.) প্রদান করেছিলেন। তিনি (আ.) বলেছিলেন, সেই আগমনকারী নবীর নাম হবে **'মুহাম্মদ'**। আরববাসীরা একথা শোনার পর নিজেদের সন্তানদের নাম **'মুহাম্মদ'** রাখতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে যেসব লোকের নাম অজ্ঞতার যুগে শুভ লক্ষণ স্বরূপ **মুহাম্মদ** রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা তিন থেকে পনেরো জন পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সীরাত ইবনে হিশামের ভাষ্যকার বা বিশ্লেষক আল্লামা সুহায়লী তিনজনের নাম লিখেছেন যাদের নাম **'মুহাম্মদ'** ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর ছয়জনের নাম লিখেছেন আর আব্দুল ওয়াহাব শে'রানী (রহ.) তাদের সংখ্যা চৌদ্দজন বলে উল্লেখ করেছেন। সবার অবগতির জন্য সেই পনেরোটি নাম বা কয়েকটি নাম আমিও বলে দিচ্ছি। তারা হলেন, মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান, মুহাম্মদ বিন উহায়হাহ্, মুহাম্মদ বিন হুমরান, মুহাম্মদ বিন খুযায়ী, মুহাম্মদ বিন আদী, মুহাম্মদ বিন ওসামাহ্, মুহাম্মদ বিন বারাআ, মুহাম্মদ বিন হারেস, মুহাম্মদ বিন হিরমায, মুহাম্মদ বিন খাওলী, মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্‌মাদী, মুহাম্মদ বিন যায়েদ, মুহাম্মদ বিন উসায়দী, মুহাম্মদ ফুকায়মী এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্। **(আব্দুল হামীদ জওদাহ্ আস্‌সাহার রচিত 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মায়াহু' ২য় খণ্ড, পৃ: ১১-১১২, মিশর থেকে প্রকাশিত) (আল্লামাহ্ সুহায়লী রচিত আর্ রওযুল উনুফ শরহু ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭২, মুহাম্মদ বিন এহইয়াহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (কাশফুল্ গুম্মাহ্ আন জামীউল উম্মাহ্ লিশ্ শা'রানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩-২৮৪, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত), {আল্ ইসাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন আল্ জাররাহ্ (রা.) হিজরত করে মদীনায় আসলে মহানবী (সা.) তার সাথে তাকে {অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে} ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি সেসব সাহাবীর একজন ছিলেন যারা কা'ব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে' সাল্লাম বিন আবু হুকায়েককে হত্যা করেছিলেন। এই দু'জন সেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ছিল যারা মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য সক্রিয় ছিল, আর এই অপচেষ্টায় রত থাকত বরং মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করানোরও অপচেষ্টা করেছে। এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপরও আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করে। তাই মহানবী (সা.) ওদেরকে হত্যা করার দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) কোন্ কোন্ যুদ্ধের সময় মদীনায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও তাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র পুত্ররা হলেন- জা'ফর, আব্দুল্লাহ্, সা'দ, আব্দুর রহমান এবং উমর আর তারা সবাই মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) কেবল তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া বদর ও ওহুদের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, কেননা তাবূকের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামিযিস্ সাহাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮-২৯, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, (শরাহ্ যুরকানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫১১, হাদীস বনী নযীর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, দু'জন নৈরাজ্যবাদী ও ইসলাম-বিরোধীর হত্যাকাণ্ডে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) যুক্ত ছিলেন। এর কিছু বিবরণ দেড় বছর পূর্বে হযরত উবাদাহ্ বিন বিশর (রা.)'র বরাতে আমি বর্ণনা করেছি। তথাপি (এখানে) কিছু কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, এছাড়া আরো কিছু বিবরণ রয়েছে। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে লিখেছেন,

বদরের যুদ্ধ মদীনার ইহুদীদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসে এবং তারা বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয় । (তারা) তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই একটি ফলাফল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদী হলেও প্রকৃত অর্থে সে ইহুদী বংশোদ্ভূত ছিল না বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ বনু নাবহানের এক ধূর্ত এবং সুপরিচিত ব্যক্তি ছিল, যে মদীনায় এসে বনু নযীরের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং তাদের মিত্র সাজে। অবশেষে সে এতটাই ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে যে, বনু নযীরের সভ্রান্ত নেতা আবু রাফে' বিন আবুল হুকায়েক নিজ কন্যাকে তার কাছে বিয়ে দেয় এবং তারই গর্ভে কা'ব জন্ম নেয়, যে বড় হয়ে তার পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে। অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে যে, গোটা আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের সর্দার বা নেতা মনে করতে আরম্ভ করে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশলে সে ছিল যারপরনাই দক্ষ। পুণ্য তার ধারে কাছেও ঘেঁষেনি। মন্দ, পাপ, বিবাদ করানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সে খুবই দক্ষতা রাখত। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর হিজরত করে মদীনায় আসার পর কা'ব বিন আশরাফও অন্যান্য ইহুদীদের সাথে সম্মিলিতভাবে সেই চুক্তিভুক্ত হয়, যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কা'ব এর হৃদয়ে হিংসা এবং শত্রুতার অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সে গোপন কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। কা'বের বিরোধিতা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। (সে) তার বিরোধিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অবেশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে যা ছিল চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার কারণ। এর ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির উন্মেষ ঘটে।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন এক অসাধারণ বিজয় লাভ করে আর কুরাইশ নেতাদের অধিকাংশ নিহত হয় তখন সে অনুধাবন করে যে, এখন এই নতুন ধর্ম সহজেই নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। পূর্বে ধারণা ছিল, এটি এক নতুন ধর্ম, এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আপনা-আপনি ধ্বংস হবে। কিন্তু ইসলামের উন্নতি দেখে ও বদরের যুদ্ধের পরিণাম দেখে তার এই ধারণা জন্মে যে, এটি এভাবে নির্মূল হবে না। অতএব, বদরের যুদ্ধের পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

কা'ব যখন সুনিশ্চিত হয় যে, সত্যিই বদরের বিজয় ইসলামকে সেই দৃঢ়তা দান করেছে যা সে কল্পনাও পারত না, তখন সে রাগ এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর ত্বরিৎ সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা

অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং (অগ্নিঝরা) কবিতার জোরে কুরাইশদের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তোলে আর তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের বক্ষকে প্রতিশোধ ও শত্রুতার অগ্নিতে ভরে দেয়। কা'বের প্ররোচনায় যখন তাদের আবেগ অনুভূতি বিস্ফোরনুখ হয়ে উঠে তখন সে তাদেরকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে খানা-কাবার পর্দা তাদের হাতে ধরিয়ে এই শপথ করায় যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন (আমরা) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না।

এরপর এই হতভাগা অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এরপর মদীনায় ফিরে এসে সে মুসলমান নারীদের নিয়ে 'তাশবীব' করে, অর্থাৎ নিজের উত্তেজক কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ও অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। এমনকি নবী-পরিবারের সম্মানিত নারীদেরও নিজের নোংরা ও অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যারও ষড়যন্ত্র করে আর কোন নিমন্ত্রণ ইত্যাদির ছলে তাঁকে নিজের বাড়িতে ডেকে কতিপয় ইহুদী যুবক দিয়ে তাঁকে হত্যা করানোর দুরভিসন্ধি করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাসময়ে এই খবর প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

অবস্থা যখন এ পর্যন্ত গড়ায় আর কা'বের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেলে মহানবী (সা.), যিনি মদীনার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে সংঘটিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদীনায় আগমনের পর মদিনাবাসীদের সাথে হয়েছিল, এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ তার অপকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কা'ব সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তখন যেহেতু মদীনার পরিবেশ এমন হয়ে উঠছিল যে, তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, যার ফলে জানা নেই কতটা রক্তপাত ও প্রাণহানী ঘটতো, আর মহানবী (সা.) যেহেতু সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে খুনোখুনি ও রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন, তাই তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে হত্যা না করে যথোপযুক্ত সুযোগ মতো কয়েকজন গোপনে তাকে হত্যা করবে। এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন, যে রীতি-ই অবলম্বন করুন না কেন তা অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা.)'র পরামর্শক্রমে করবেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! নীরবে হত্যা করার জন্য তো কোন কথা বলতে হবে, অর্থাৎ কোন অজুহাত দেখাতে হবে, যার ভিত্তিতে কা'বকে তার বাড়ি থেকে ডেকে এনে কোন নিরাপদ স্থানে হত্যা করা সম্ভব হবে। তিনি (সা.) সেই ভয়াবহ পরিণামকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এ ক্ষেত্রে নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারতো, এতে সম্মতি প্রদান করেন। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)'র পরামর্শক্রমে আবু নায়েলা (রা.)'র সাথে আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নিয়ে কা'বের বাড়িতে পৌঁছেন এবং কা'বকে তার বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে এনে বলেন, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে সদকা বা আর্থিক কুরবানীর চাচ্ছেন, কিন্তু আমরা অসচ্ছল, তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কিছু ঋণ দিতে পার? এ কথা শুনে কা'ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং বলে, আল্লাহ্র কসম! এখনো কিছুই হয় নি, সেদিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) উত্তর দেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শিরোধার্য করেছি; (এখন) তোমার

কাছে যে কাজের জন্য এসেছি, তুমি বল যে, ঋণ দিবে কিনা? কা'ব বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী জিনিস? সেই দুর্ভাগা উত্তর বলে, তোমাদের (বাড়ির) মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি (রা.) ক্রোধ দমন করে বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে, তোমার মতো মানুষের কাছে আমরা আমাদের নারীদের বন্ধক রাখব? সে বলে, তাহলে তোমাদের পুত্রদের রাখলেও চলবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, এটিও অসম্ভব। (কেননা) আমরা সমগ্র আরবের খোঁটা সহ্য করতে পারব না। তবে, তুমি যদি সদয় হও তাহলে আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখছি। (এতে) কা'ব সম্মত হয় আর মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) এবং তার সাথিরা (আবার) রাতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই এই (ছোট্ট) দলটি সশস্ত্র হয়ে কা'বের বাড়িতে পৌঁছে, কেননা তখন তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারতেন, যা চুক্তি অনুসারে (তার কাছে বন্ধক) রাখার কথা ছিল। এরপর তারা তাকে ঘর থেকে ডেকে এনে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে যায় আর কিছুক্ষণ পর চলন্ত অবস্থায় মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বা তার কোন সাথি কোন অজুহাতে কা'বের মাথায় হাত দেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার চুলগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরে নিজ সঙ্গীদের বলেন, আঘাত কর। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ও অস্ত্রে সজ্জিত সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাত হানেন আর অবশেষে কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) এবং তার সাথিরা সেই স্থান ত্যাগ করে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং তাঁকে (সা.) এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রদান করেন।

কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ জানাজানি হলে শহরে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর ইহুদীরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায়। পরের দিন প্রভাতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে, আমাদের সর্দার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জান, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি সংক্ষেপে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল কথা বলা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে নীরব হয়ে যায় আর কোন উচ্চবাচ্চ করে নি। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত, ভবিষ্যতে অন্ততপক্ষে শান্তি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। অতএব ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদীরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকার এবং ফিতনা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিত্যাগের অঙ্গীকার করে।

কা'ব যদি অপরাধী না হতো তাহলে ইহুদীরা কখনো এত সহজে নতুন চুক্তি করত না আর তাকে হত্যার পর নিশ্চুপ বসে থাকত না। যাহোক, তারা এই নতুন চুক্তি করে যে, ভবিষ্যতে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করব। ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, এ ঘটনার পর ইহুদীরা কখনও কা'ব বিন আশরাফের হত্যার উল্লেখ করে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করেছে; কেননা তাদের হৃদয় এটি অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কা'ব তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে কোন কোন পশ্চিমা ইতিহাসবিদ অনেক কিছু লিখেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রে এক দৃষ্টিকটু কালিমা হিসেবে উপস্থাপন করে বিভিন্ন আপত্তি করেছে। কিন্তু দেখার বিষয় হল- প্রথমত এই হত্যাকাণ্ড কি নিজ সত্তায় একটি বৈধ কার্য ছিল, নাকি ছিল না? আর দ্বিতীয়ত এই হত্যার জন্য যে রীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা কি বৈধ ছিল, নাকি ছিল না?

প্রথম কথা হল- এটি স্মরণ রাখা উচিত, কা'ব বিন আশরাফ মহানবী (সা.)-এর সাথে রীতিমত শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করেছিল। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ তো দূরে থাক, বরং সে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, প্রত্যেক বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সে মুসলমানদের সহায়তা করবে এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। এই চুক্তির আলোকে সে এটিও স্বীকার করেছিল যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ধারা মদীনাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) এর প্রধান হবেন এবং সর্বপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর (সা.)

সিদ্ধান্ত সবার জন্য মান্য করা আবশ্যক হবে। যেমন ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত, এই চুক্তির অধীনেই ইহুদীরা তাদের মামলা-মোকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করত এবং তিনি (সা.) সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন।

এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও যদি কা'ব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার উপেক্ষা করে মুসলমানদের সাথে, বরং প্রকৃত কথা হল, সমসাময়িক সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মদীনায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করে আর দেশে যুদ্ধের অনল উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে, অধিকন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলোকে চরমভাবে উত্তেজিত করে এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তাহলে এ অবস্থায় কা'ব-এর অপরাধ, বরং বহু অপরাধের হোতার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অযৌক্তিক হতে পারে কি? এই ইহুদীর নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্য মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে লঘু আর কোন শাস্তি হতে পারত কি? অধুনাকালের তথাকথিত সভ্য জাতি হিসেবে অভিহিত রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্রোহ, অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা ও হত্যা-ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধীকে কি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় না?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এখন হত্যার রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হত্যা-পদ্ধতি বৈধ ছিল কিনা? অর্থাৎ প্রশ্ন হল, হত্যা করার পদ্ধতি কেমন ছিল? এ সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্ন।

এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত, সে সময় আরবে নিয়মতান্ত্রিক কোন সরকারব্যবস্থা ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এমতাবস্থায় এমন কোন্ আদালত ছিল যেখানে কা'বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত মৃত্যুদণ্ডাদেশ হস্তগত করা যেত? তার বিরুদ্ধে কি ইহুদীদের নিকট অভিযোগ করা যেত– যাদের সে নেতা ছিল, বরং যারা নিজেরাই কিনা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং প্রতিনিয়ত অশান্তি সৃষ্টি করত? মক্কার কুরাইশদের নিকট কি মামলা করা যেত, যারা মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল? সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের কাছে কি সাহায্য চাওয়া যেত, যারা (নিজেরাই) বিগত কয়েক মাসে তিন-চারবার মদিনায় অতর্কিতে আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিল?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কাজেই চিন্তা করে দেখুন! যখন এক ব্যক্তির উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য ছড়ানো ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে তার জীবনকে নিজের জন্য ও দেশের শান্তির জন্য বিপজ্জনক দেখে আত্মরক্ষার মানসে সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করা ছাড়া মুসলমানদের নিকট আর কোন পথ খোলা ছিল? কেননা বহু শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়া এবং দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পরিবর্তে একজন দুষ্ট ও নৈরাজ্যবাদীর মৃত্যু অনেক উত্তম।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদীদের মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সে অনুসারে মহানবী (সা.) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে {তিনি (সা.} যে সিদ্ধান্ত উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই, তিনি (সা.) দেশের শান্তির স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

অতএব, এ মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তে কোন আপত্তির অবকাশ নেই। উপরন্তু ইতিহাস থেকে এটিও প্রমাণিত যে, স্বয়ং ইহুদীরা কা'বের এ শাস্তিকে তার অপরাধের কারণে আবশ্যক জ্ঞান করে নীরবতা অবলম্বন করে এবং এতে আপত্তি করে নি। যদি এ আপত্তি করা হয় যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়ার পূর্বে ইহুদীদের ডেকে তাদেরকে কা'বের অপরাধ সম্পর্কে কেন অবহিত করা হয় নি এবং পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের পর যথারীতি ও প্রকাশ্যে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয় নি? তবে এর উত্তর হল, সে সময় পরিস্থিতি এমন স্পর্শকাতর হয়ে উঠছিল যে, এমন পন্থা অবলম্বন করলে জাতিগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ার চরম আশংকা ছিল অধিকন্তু মদীনায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের এক ধারা সূচিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

অতএব সেসব কাজের ন্যায় যা দ্রুত এবং নীরবতার সাথে সম্পাদন করা-ই কল্যাণকর হয়ে থাকে, মহানবী (সা.) সর্বসাধারণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে এটাই উপযুক্ত মনে করেন যে, নীরবে কা'বের শাস্তির নির্দেশ জারী করা উচিত; কিন্তু এতে মোটেই কোন ধরনের প্রতারণা ছিল না আর মহানবী (স.)-এর এ ইচ্ছাও ছিল না যে, এ শাস্তির বিষয়টি সদা গোপন থাকবে, কেননা ইহুদীদের প্রতিনিধি দল পরের দিন সকালে তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হতেই, তিনি (সা.) কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে তাদেরকে পুরো বৃত্তান্ত শুনিয়ে দেন এবং এ কাজের পূর্ণ দায়ভার নিজের ওপর নিয়ে এটি প্রমাণ করে দেন যে, এতে প্রতারণার কোন প্রশ্নই উঠেনা এবং ইহুদীদেরকে এটি পরিষ্কারভাবে বলে দেন, অমুক অমুক গুরুতর অপরাধের কারণে কা'বের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল যা আমার আদেশে জারি করা হয়েছে।

বাকি রইল এ আপত্তি যে, তখন মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে মিথ্যা বলা ও প্রতারণার অনুমতি দিয়েছেন! এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সঠিক রেওয়ায়েত একে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মহানবী (সা.) কখনো মিথ্যা ও প্রতারণার অনুমতি দেননি, বরং বুখারীর হাদীস অনুসারে যখন মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কা'বকে গোপনে হত্যা করার জন্য কিছু বলতে হবে; তখন তিনি সেই মহা কল্যাণকে দৃষ্টিপটে রেখে যা গোপনে শাস্তি প্রদানের কারণ হয়েছে, উত্তরে শুধু এটুকু বলেছেন, হ্যাঁ। তখন এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে বা মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র পক্ষ থেকে এরচেয়ে বেশি কোন ব্যাখ্যা আদৌ করা করা হয় নি। মহানবী (সা.)-এর কথার মর্ম শুধু এটি ছিল যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) এবং তার সাথীদেরকে যারা কা'বের বাড়িতে গিয়ে তাকে বাইরে বের করে আনবে; ঐ সময় অবশ্যই এমন কোন কথা বলতে হবে যার ফলে কা'ব স্বেচ্ছায় ও নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে চলে আসবে। এতে মোটেই দোষের কিছু নেই। যুদ্ধের সময় গুপ্তচর প্রমুখদেরও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের কথা বলতে হয়, যার ওপর কখনো কোন বুদ্ধিমান আপত্তি করে নি। অতএব, মহানবী (সা.)-এর চরিত্র অবশ্যই পবিত্র। বাকি থাকল মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-দের বিষয়, যারা সেখানে গিয়ে বাস্তবে এ ধরনের কথা বলেছিলেন; তাদের আলাপচারিতার মাঝেও প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা পরিপন্থী কিছু ছিল না। তাঁরা প্রকৃতপক্ষেই কোন মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। যদিও নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করেছেন। এমন কথা বলেছিলেন যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, কিন্তু এছাড়া কোন গত্যন্তরও ছিল না আর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে একটি মহান ও পুণ্য উদ্দেশ্যে সোজা ও পরিষ্কার আলাপচারিতার রীতি হতে এতটুকু সূক্ষ্ম বিচ্যুতি কোনভাবেই বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আপত্তিকর হতে পারে না।

এখন কেউ কেউ এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে, যুদ্ধে মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা বৈধ কিনা? কোন কোন হাদীসে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ এক প্রকার প্রতারণা। আর এ থেকে এই অর্থ নেয়া হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অথচ প্রথমত اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ-এর অর্থ এটি নয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়া বৈধ বরং এর অর্থ হল, যুদ্ধ স্বয়ং একটি ধোঁকা। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে (আগেভাগে) কিছুই বলা যায় না যে, কী হবে। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফলকে এত বেশি বিষয় প্রভাবিত করে যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন; ফলাফল কী হবে তা বলা যায় না। আর এই অর্থের সত্যায়ন এভাবে হয়: এই রেওয়ায়েতটি হাদীসে দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি রওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ। অর্থাৎ যুদ্ধ একটি ধোঁকা। আর অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে, سَمّٰى الْحَرْبَ خُدْعَةً অর্থাৎ মহানবী (সা.) যুদ্ধের নাম ধোঁকা বা প্রতারণা রেখেছিলেন। আর উভয়টিকে একত্র করলে এই ফলাফল দাঁড়ায়, মহানবী (সা.)-এর

বলার উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া বৈধ, বরং একথার মর্ম ছিল, যুদ্ধ স্বয়ং একটি প্রহসন। কিন্তু যদি আবশ্যিকভাবে এর এই অর্থও করা হয় যে, যুদ্ধে প্রতারণা (করা) বৈধ তবুও এক্ষেত্রে প্রতারণা বলতে রণকৌশল বা (যুদ্ধের) পরিকল্পনা বুঝানো হয়েছে, এর অর্থ কোনভাবেই মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা নয়। কেননা এখানে خُدْعَة এর অর্থ হল, পরিকল্পনা ও রণকৌশল, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নয়। কাজেই (এর) অর্থ হল, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে কোন কৌশল বা পরিকল্পনা দ্বারা অন্যমনস্ক করে পরাভূত করা অথবা পরাজিত করা বারণ নয়।

পরিকল্পনা বা কৌশলেরও বিভিন্ন ধরন হতে পারে। উদহারণস্বরূপ সহীহ্ হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত, অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন কোন অভিযানে বের হতেন তখন সাধারণত নিজের গন্তব্যের কথা প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় এমনও করতেন, যাবেন হয়ত দক্ষিণে কিন্তু শুরুতে উত্তর দিকে যাত্রা করতেন এরপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে যেতেন। অথবা কখনো কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, কোত্থেকে এসেছ? তখন মদীনার নাম উল্লেখ না করে নিকটস্থ বা দূরবর্তী কোন অবস্থানস্থলের নাম বলে দিতেন। অথবা এ ধরনের অন্য কোন বৈধ রণকৌশল অবলম্বন করতেন। অথবা যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সাহাবীগণ অনেক সময় এমনটি করতেন যে, শত্রুদের অসতর্ক করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হতে পিছু হটতে আরম্ভ করতেন আর শত্রু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে তাদের সারিগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তখন অকস্মাৎ আক্রমন করতেন। এগুলো সবই خُدْعَة এর অংশ যাকে যুদ্ধাবস্থায় বৈধ আখ্যা দেয়া হয়েছে আর এখনও বৈধ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণকে ইসলাম কঠোরভাবে বারণ করে। যেমন মহানবী (সা.) সাধারণত বলতেন, ইসলামে খোদার সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অধিকার খর্ব করার পর তৃতীয় পর্যায়ে মিথ্যা বলার পাপ হল, সবচেয়ে বড় পাপ। তিনি (সা.) আরো বলতেন, ঈমান ও ভীরুতা একস্থানে সমবেত হতে পারে কিন্তু ঈমান ও মিথ্যা কখনো সহাবস্থান করতে পারে না। আর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কিয়ামত দিবসে খোদা তা'লার কঠোর শাস্তির শিকার হবে। মোটকথা, যুদ্ধে যে ধরনের خُدْعَة এর অনুমতি দেয়া হয়েছে তা সত্যিকার প্রতারণা বা মিথ্যা নয়, বরং এর দ্বারা সেই রণকৌশল বুঝানো হয়েছে যা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে অসতর্ক করা বা তাকে পরাজিত করার জন্য অবলম্বন করা হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে যাকে বাহ্যত মিথ্যা বা প্রতারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা নয়। অতএব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, আমাদের মতে নিম্নোক্ত হাদীস এর সত্যায়ন করে আর সেই হাদীসটি হল,

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের অনুমতি প্রদান করতে শুনেছি যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা হয় না কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলবশত একে মিথ্যা মনে করতে পারে। প্রথমত যুদ্ধ, দ্বিতীয়ত বিবাদমান লোকদের মাঝে মীমাংসা করনোর ক্ষেত্রে আর তৃতীয়ত স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এমন কোন কথা বলতে পারে যাতে পরস্পরকে প্রীত ও আনন্দিত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় সদিচ্ছা থাকা বাঞ্ছনীয় অথবা সৎ উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া চাই।

এই হাদীস এক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের خُدْعَة বা কৌশলের অনুমতি দেয়া হয়েছে এর উদ্দেশ্য মিথ্যা বা প্রতারণা নয় বরং এর অর্থ হল, সেসব বিষয় যা অনেক সময় রণকৌশল হিসেবে অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে আর যা সকল জাতি এবং ধর্মে বৈধ জ্ঞান করা হয়।

কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা বর্ণনা করার পর ইবনে হিশাম এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, কা'ব-এর হত্যার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এখন তোমরা যে ইহুদীর পরাভূত করতে পারবে তাকে হত্যা করবে। এ কারণে মুহাইয়্যেসা নামের একজন সাহাবী এক ইহুদীর ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছিল। আর এই রেওয়ায়েতটিই আবু দাঊদ উদ্ধৃত করেছেন এবং উভয় রেওয়ায়েতের উৎস হলেন, ইবনে ইসহাক। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ইলমে রেওয়ায়েত (অর্থাৎ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী সম্পর্কিত জ্ঞান)-এর দিক থেকে এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য। মহানবী (সা.) মোটেই এ কথা বলেন নি, কেননা ইবনে হিশাম এটিকে কোন প্রকার **সনদ** (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ) ছাড়া লিখেছেন, এর কোন সনদ-ই নেই। আর আবু দাঊদ যে সনদ প্রদান করেছেন তা দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। ইবনে ইসহাক এই সনদে বর্ণনা করেন, আমি এই ঘটনাটি যায়েদ বিন সাবেতের এক মুক্ত ক্রীতদাসের কাছে শুনেছিলাম আর এই নাম না জানা দাস, অর্থাৎ জানা নেই সে কে এবং তার নামই বা কী। (আর এই মুক্ত দাস) মুহাইয়্যেসা-র এক অজানা মেয়ের কাছ থেকে তা শুনেছে। আর সে-ও (অর্থাৎ সেই নাম না জানা ক্রীতদাস) আরেকজন মেয়ের কথা বলছে যার নামও অজানা। কোন রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, সেই মেয়েটি কে। আবার সেই মেয়ে তার পিতার কাছে শুনেছে। এখন যে কেউ বুঝবে, এ ধরনের রেওয়ায়েত মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যার দু'জন বর্ণনাকারীর নাম সম্পূর্ণরূপে অজানা, যারা একেবারেই অপরিচিত। আর **দেরায়েত** (অর্থাৎ হাদীসের বিষয়বস্তু) এর দিক থেকেও যদি প্রণিধান করা হয় তাহলে এই ঘটনা সঠিক প্রমাণিত হয় না। কেননা মহানবী (সা.)-এর সাধারণ কর্মপন্থা এ বক্তব্যকে পুরোপুরি মিথ্যা সাব্যস্ত করে যে, তিনি (সা.) এরূপ গণ-নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। উপরন্তু যদি কোন গণআদেশ হতো তাহলে অবশ্যই এর ফলাফলস্বরূপ বহু হত্যার ঘটনা ঘটত। কিন্তু বিবরণে কেবল একটি হত্যার উল্লেখ রয়েছে যা এ কথার প্রমাণ যে, এটি কোন গণ-নির্দেশ ছিল না। এছাড়া সহীহ্ হাদীস থেকে যেহেতু এটি প্রমাণিত যে, পরের দিনই ইহুদীদের সাথে নতুন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল, তাই এটি মোটেই মেনে নেয়া যায় না যে, এরূপ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এমন নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটত তাহলে ইহুদীরা অবশ্যই এ সম্পর্কে হা-হুতাশ ও হট্টগোল করত। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে কখনও এ ধরনের কোন অভিযোগ করা হয়েছে। অতএব **রেওয়ায়েত** ও **দেরায়েত**– উভয় দিক থেকে এই কাহিনী ভুল প্রমাণিত হয়। আর এতে কেবল এতটুকু বাস্তবতা আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার পর মদীনায় যখন এক প্রকার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আর ইহুদীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.) ইহুদীদের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করে সাহাবীদের এ কথা বলে থাকবেন। এটিও নিছক একটি সম্ভাবনা মাত্র, এরও কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। অর্থাৎ কোন ইহুদীর পক্ষ থেকে আশংকা দেখলে আর তোমার ওপর যদি আক্রমণ করে তাহলে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করতে পার। কিন্তু মনে হয়, এরূপ অবস্থা কেবল কয়েক ঘন্টা বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ যদি এই সম্ভাবনাকেও (সত্য বলে) গ্রহণ করা হয় তাহলে তা কেবল কয়েক ঘন্টা ছিল, কেননা এরপর তো চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পরের দিনই ইহুদীদের সাথে নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর তিনি (রা.) লিখেন, কা'ব বিন আশরাফ-এর হত্যার তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইবনে সা'দ একে তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে হিশাম এটিকে যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.)'র অভিযানের পর রেখেছেন যা সর্বসম্মতভাবে জমাদিউল আখেরা'তে সংঘটিত হয়েছে। তিনি (রা.) লিখেন, আমি এখানে ইবনে হিশাম এর ধারাবাহিকতা দৃষ্টিপটে রেখেছি। {হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৬৬-৪৭৭ দ্রষ্টব্য}

যাহোক, (এই স্মৃতিচারণে) আরো দু'একটি ঘটনা অবশিষ্ট রয়েছে, তা পরবর্তীতে উপস্থাপিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃঃ ৫-৮)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)